শতাব্দীর বাংলা সাময়িকপত্র

প্রভাতকুমার দাস

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকটি বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা, শ্রীরামপুর বাপটিস্ট মিশনারিরা বাঙলি পাঠকদের জন্য ইতিপূর্বে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশ করলেও, তাঁরাএই প্রথম দুটি স ামায়িক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পা দিত মাসিক দিগ্দর্শন, যুবলোকের কারণে সংগৃহীত নানা উপদেশ প্রচার করাই সে পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য। ওই বছরের ২৩ মে ফেলিক্স কেরিও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের পরিচালনায় প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, উদ্দেশ্য ইংলণ্ড ও ইওরোপের নানা সংবাদের সঙ্গে সদ্য প্রকাশিত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ থেকে সময়োপযোগী তথ্যের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। শেষোক্ত পত্রিকার সমসাময়িক কালে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে মিশন প্রেসের বাঙালি কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, বন্ধু হরচন্দ্র রায়-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাঙ্গাল গেজেটি নামের আরও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এইসব পত্রিকার প্রভাব এত দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল যে, পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রকাশিত হয় ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), এবং সম্ব াদ তিমির নাশক (১৮২৩)

উপযুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল অর্ধশতকব্যাপী, কৌমুদী ও চন্দ্রিকা যথাক্রমে উনবিংশ শতকের তিরিশে ও পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত। অবশ্য কৌমুদী ও চন্দ্রিকা -র পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ তদানীন্তন পাঠক সমাজে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত, সমাচার দর্পণ এই বিবাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করেছিল উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব ২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক স ম্পদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিশনারিদের সঙ্গে রামমোহন রায় -এর মতানৈক্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল ব্রাহ্মণ সেবধি, সেই বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক মত আরো প্রকটভাবে প্রকাশের কারণেই আবির্ভাব ঘটে সম্বাদ কৌমুদী -র আবার রামমোহন -এর প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্পাদকতায় প্রকাশ করেন সমাচার চন্দ্রিকা। বোঝাই যাচ্ছে ধর্মীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া ওই পত্রিকাগুলির সম্মুখে অন্য কোন কারণ ছিলনা, সাহিত্যিক প্রচার তখনো উদ্যোক্তারা মান্য বলে গ্রহণ করেননি। এমন কি এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী পঞ্চান্ন বছর সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রকাশের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন ও ভাব উপদেশ আহরণ - বিতরনই প্রাধান্য পেয়েছে। সাধ ারণ পাঠক সমাজের বোধগম্য করে তোলার জন্য অবশ্য ভাষাগত পরীক্ষায় লেখক মণ্ডলী মনোযোগী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অন্যতম সাময়িক পত্রিকা দিগ্দর্শন, ছাত্রপাঠ্য বিষয়সমূহের প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একদিকে ধর্ম, দর্শন, শাস্ত্র এবং নীতিশিক্ষামূলক রচনা যেমন সে সময়ের সাময়িক পত্রিকাগুলির প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল, তেমন অন্যদিকে সংবাদপত্রধর্মিতাই প্রাধান্য পেয়েছে অন্যতর সাময়িকীগুলিতে। এই ধারারই উত্তরসাধক হিসেবে সাপ্তাহিক বঙ্গদূত (১৮২৯) এবং সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) পত্রিকার উল্লেখ করা যায়, প্রথমোক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, নীলরত্ন হালদার। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিক াশকে অত্যন্ত গুত্বের সঙ্গে দেখা এই পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। অন্যদিকে, রক্ষণশীল হিন্দুদের আগ্রহে প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকর, ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদনায়, সাহায্য করেছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র ও নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, যিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ও তাঁর কাব্যানুরাগী ছিলেন।

এসময়, শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজিভাষা চর্চার সমাদর যেমন বহু ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমন বাংলা ভ াষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের প্রসারের দিকেও একদল যুবক এক সংগঠিত আন্দোলন শু করেছিলেন,যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নবযুগের জ্ঞানচর্চায় সদ্যোদ্ভূত গদ্যভাষাকে কোন কোন দিক থেকে সুচা ও ব্যবহারোপযোগী করে সর্বজনবোধগম্য করে তোলা সম্ভব তারও একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিলক্ষিত হয় সাময়িক পত্রিকাগুলিতে। একাজে সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৯৪৩), অক্ষয়কুমার দত্ত-র সম্পাদনায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্য াসাগর এই পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুত্ত হয়েছিলেন। যেকোনো আধুনিক বিষয় ভাবনায় তৎপর অনুশীলনে তত্ত্ববো ধিনী বাঙালিসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। তত্ত্ববোধিনীর আগে পরে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি হল সাপ্তাহিক জ্ঞান ান্বেষণ (১৮৩১), মাসিক বিজ্ঞানসেবধি (১৮৩২), পাক্ষিক বিজ্ঞান সারসংগ্রহ (১৮৩৩), মাসিক সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৩৫), সাপ্তাহিক সংবাদ ভাস্কর (১৮৩৯), মাসিক বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), মাসিক (১৮৫৪)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র স ম্পাদিক বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার কলেবর পূর্ণহত পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থা দির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য - ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন বিবরণ, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়। বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বালকবয়স রবীন্দ্রনাথও এই পত্রিকাটির প্রতি কীভাবে আকর্ষণ বোধ করতেন সে বিষয়ে পরিণত বয়সের স্মৃতিচর্চায় জানিয়েছেন বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকীতে বইটাকে বুকে লইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুম ারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটিরদিনের মধ্যাহ্ কাটিয়াছে। অবশ্য সাহিত্য ও ভাষাশিক্ষার জন্য বিবিধার্থ সংগ্রহ-র তুলন ায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র সমাদর অধিকতর হলেও, প্রকৃত অর্থে মধ্যবিত্ত সাধারণ পাঠকসমাজের সাহিত্যপাঠের চি গঠনে বিবিধার্থ সংগ্রহ-র ভূমিকা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। বিবিধার্থ-র পরে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত ম াসিক পত্রিকার বিশেষত্বও বিশেষ উল্লেখ্য ও তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য বিষয়ে জানিয়েছিলেন এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।

ত্রমবর্ধমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আগ্রহ থেকেই পরপর যে কটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় তার মধ্যে সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), অবোধবন্ধু (১৮৬৩), সুলভ সমাচার (১৮৭০) খুবই উল্লেখযোগ্য। এঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, বিদ্যাসাগর-এর সহায়ত ায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ বাঙালি মানসে জাতীয়তাবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। উপর্যুত্ত তিনটি পত্রিকার মধ্যে সোমপ্রকাশ ও সুলভ সমাচার রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে গুত্ব দিত বেশি, অন্যদিকে অবে াধবন্ধু-র বিষয় প্রাধান্য ছিল সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা নামে আভিহিত করেছিলেন। কবি বিহারীলাল চত্রবর্তী-র অনেক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে বিহারীলাল পূর্ণিমা (১৮৫৯) নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। কবি বিহারীলাল চত্রবর্তীর অনেক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময় আর একটি পত্রিকার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়, সেটি ঢাকা থেকে হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত কবিতা কুসুমাবলী (১৮৬০), তাঁরা মনে করতেন বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ সাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য। সুলভ -এর সমসাময়িককালে কেশবচন্দ্র সেন এক পয়সায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ / ১৮৭০), সোমপ্রকাশ -এর মতো সে পত্রিকা রায়তদের উপর জমিদারি ও সরকারের অত্যাচারের কথা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লিখতে দ্বিধা করত না। অবোধবন্ধু-র সমসময়ে মজিলপুরের তণ ব্রাহ্ম উমেশচন্দ্র দত্ত মাসিক বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩) সম্পাদনা করেন, সে পত্রিকার উদ্দেশ্য এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদয় বিষয় লিখিত হইবে। ভ্রম ও কুসংস্কার দূর হয়ে যাতে তাঁদের প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, সে বিষয়ে পত্রিকা সম্পাদক বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

অবোধবন্ধু পত্রিকায় সাহিত্যের প্রাধান্য, পরবর্তীকালে বঙ্গদর্শন-কে (১৮৭২) কেন্দ্র করে সম্পূর্ন নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন -এর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বহরমপুরে, তখন সেখানে যেসব স্বনামখ্যাত পণ্ডিত, মনীষী ও সাহিত্যিকরা সম্মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, গুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। লালবিহারী দে -ও তখন বহরমপুরে অধ্যাপনা করতেন। যদিও নিছক সাহিত্যচর্চাই বঙ্গদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিলনা, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও জাতীয় প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মৌলিক সাহিত্যের পাশে অত্যন্ত গুত্ব পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনকে অ াধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাত সূর্য হিসেবে আখ্যাত করে যুগসন্ধির শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যবাহনটির আবির্ভাবকালীন পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবোকাওলি, সেইসব বালক ভুলানো কথা --- কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শন -এর মাধ্যমে দেশের ভাবজীবনে একটা বিপুল আলোড়ন তুলেছিলেন, নিজের মনন ও চিন্তনের পাশাপাশি সমকালীন পণ্ডিত ভাবুকদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশের অনেকটা মুক্ত অঙ্গন তৈরি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মব্যস্ততার কারণে, মাত্র চার বছর পরে সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে সে পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করে যে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু--- অন্যদিকে শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বঙ্গদর্শন-এর সমসাময়িক কিংবা অব্যবহিত পরবর্তীকালে যে সব সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সাধারণী (১৮৭৩), বসন্তক (১৮৭৪), ভ্রমর (১৮৭৪), বান্ধব (১৮৭৫), তত্ত্বকৌমুদী (১৮৭৮), বঙ্গবাসী (১৮৮১), জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব (১৮৮২), হিতবাদী (১৮৯১)। শেষোক্ত দুটি পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-এর সংযোগ ছিল, বিশেষত হিতবাদী পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি, এই পত্রিকাতেই তাঁর ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল, প্রতি সপ্তাহেই ছোটগল্প সমালোচনা ও সাহিত্য - প্রবন্ধ লিখতেন তিনি। পত্রিকাটির বিশেষত্ব, একটি বড় রকমের কোম্পানি খুলে পঁচিশ হাজার টাকার মূলধন নিয়ে উদ্যোক্তারা কাজে নামতে চেয়েছিলেন। ১৮৭৭ -এ প্রকাশিত ভারতী, সাহিত্য সাময়িকীর ধারায় একটি অনন্য সাধারণ সংযোজন প্রথমত সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর , উদ্দেশ্য প্রথমাবধি স্পষ্ট ভাষায় উচচারণ করে তাঁরা জানিয়েছিলেন জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নত মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্ব দেশীয় ভাবকেই বিদেশ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। এই জাতীয়তাবোধ তদানীন্তন পাঠক সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ -এর চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ করেছিল সাধনা (১৮৯১), চতুর্থ বর্ষে সম্পাদক হন রবীন্দ্রনাথ, তিনি লিখেছেন সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভুরিপরিমান ছিল। ঠাকুর বাড়ির সাহিত্য চর্চায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -এর সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত বালক (১৮৮৫) পত্রিকাটির উল্লেখ আবশ্যক, বছরখানেক পরে অবশ্য সেটি ভারতী-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভারতী ও বালক, নাম ধারণ করে , এই যুগ্ম নাম অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকটিতে যে কটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল সাহিত্য (১৮৯০), জন্মভূমি (১৮৯০), পূর্ণিমা (১৮৯৩), সৌরভ (১৮৯৫), শিলাতত্ত্ব ও পুষ্পাঞ্জলি (১৮৯৬), প্রদীপ (১৮৯৭), প্রয়াস (১৮৯৯)। শেষের পত্রিকাটি নবীন লেখকদের উৎসাহ প্রদান দ্বারা বাংলা - সাহিত্য-সমাজের উন্নতিবিধান করাকেই উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। দশকটির শেষপ্রান্তে প্রকাশিত হয়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক পত্র উদ্বোধন (১৮৯৯), যেটি এখনো পর্যন্ত সময়ের হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী পত্রিকা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সাময়িক পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা প্রায় এগারো বছর স্থগিত থাকার পর বঙ্গ দর্শন (১৯০১) পত্রিকার নবপর্যায় সম্পাদনার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ -এর দায়িত্ব গ্রহণ। অবশ্য ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শন -এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখক হিসেবে কোনো সংযোগ ঘটেনি, যদিও তিনি আবাল্য সে পত্রিকার ভক্তছিলেন। তাঁর সম্পাদিত প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় সূচনা শীর্ষক রচনায় তিনি লিখেছিলেন অধুনা বঙ্গদেশে যে কেহ সুলেখক আছেন, বঙ্গদর্শন তঁাহাকে আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গ সাহিত্য ও বাঙালী লেখকদের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সাহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে, ভাবের পথ ততই সূদূরবিস্তৃত এবং সাহিত্যের আদর্শ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্গদর্শন-কে বহন করে চলা তিনি বঙ্গসাহিত্যকে পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত করিবার একটি উপায় বলে মনে করেছিলেন। তাঁর একমাত্র সম্পাদকীয় চেষ্টা ছিল বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পথে পরিচালিত করা। একই বৈশাখ মাসে, কিন্তু সামান্য পূর্বে এলাহাবাদ শহরে ভূমিষ্ঠহল প্রবাসী নামক আর একটি নতুন পত্রিকা, স্বত্বাধিকারী ও মালিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এ পত্রিকার সূচনা শীর্ষক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁরা জানালেন সর্ববসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা প্রবাসী প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিক পত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি,কি ছাপা, সকল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই তাহাহইলে নিশ্চয়ই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে। আশা ও উদ্দেশ্য বিষয়ে তাঁরা নীরবতা পালন করেছিলেন, কেননা তাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্যের বিচার হওয়া ভালো। প্রথমসংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী নামে, বলা যায় তিনিই সে পত্রিকার প্রধান স্তম্ভ। বছর চারেক পরে, কলকাতায় প্রবাসীর স্থায়ী স্থানান্তর ঘটে, সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রবাসী-র কলকাতায় আসার আগে সাহিত্যক্ষেত্রে যমুনা (১৯০৩) পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু বছরতিনেক পরে তার অন্তর্ধান ঘটে, পরবর্তীকালে যমুনা-র খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল শরৎচন্দ্রর রচনার গুণে ও আন্তরিকআনুকূল্যের কারণে। সে সময়, সাহিত্য জগতের একটি দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা - দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রয়াণ, তিনি ভারতবর্ষ (১৯১২) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন, স্থির ছিল নিজেই সম্পাদনা করবেন, প্রথম সংখ্যার পরিকল্পনা, রচনা নির্বাচন, এমনকি সম্পাদকীয় রচনার কাজ শেষ করার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। শেষপর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের যুগ্মসম্পাদনায় এ পত্রিকাটিরও সম্পদ ও অন্যতম আকর্ষণ বিবেচিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রর রচনা।

প্রবাসী প্রকাশের চৌদ্দ বছরের ব্যবধানে মাত্র আটমাস আগে পরে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, প্রথমটি বঙ্গাব্দ ১৩২১ -এর বৈশাখে সবুজপত্র, আর দ্বিতীয়টির নাম নারায়ণ, প্রকাশমাস অগ্রহায়ণ। সবুজপত্র-র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রমথ চৌধুরী, কিন্তু নেপথ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাণ্য ও আধুনিকতার মুখপত্র হিসাবে পত্রিকাটির পরিপূর্ণ বিকাশে তাঁর প্রেরণাই সবচয়েয়ে কার্যকরী হয়েছিল। নবতর রবীন্দ্রসাহিত্যও এক দুরন্ত সাহসিকতায় নতুন বাঁক নিয়েছে সবুজপত্র কে বাহন করে। অন্যদিকে নারায়ণ সম্পাাদনা করতেন চিত্তরঞ্জন দাশ, তখনো পর্যন্ত জননায়ক পদে তাঁর অভ্যুত্থান ঘটেনি, অবশ্য পত্রিকার যাবতীয় নেপথ্য দায়িত্ব পালন করতেন বিপিনচন্দ্র পাল। রবীন্দ্রবিরোধিতায় নারায়ণ অনেকটা সবুজপত্রর প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতিসম্পাদিত সাহিত্য -র নাম উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের রচনাকে আত্রমণ করাই সে পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। পূর্ববর্তী শতাব্দীতে প্রকাশিত হলেও, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত তার সময়কাল বিস্তৃত হয়েছিল। প্রবাসী ও ভারতবর্ষ -র মতো মাসিক বসুমতী -তে (১৯২২) সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতায় বসুমতী সাহিত্য মন্দির শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ ও দিক্‌পাল সাহিত্যস্রষ্টাদের গ্রন্থাবলি প্রকাশ করে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

সবুজপত্র প্রকাশের পূর্বে যে কটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখনীয় হল অর্চনা (১৯৩০), উপাসনা (১৯০৪), মানসী (১৯০৮), গৃহস্থ (১৯০৯), অর্ঘ্য (১৯১১), প্রতিভা (১৯১১), সৌরভ (১৯১২), গল্পলহরী (১৯১২)। সবুজপত্র-র সঙ্গে একইমাসে প্রকাশিত হয় মালঞ্চ (১৯১৪)---সরস ও সারগর্ভ সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র পত্রিকা। তার এক বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল সচিত্র পত্রিকা। তার এক বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল মর্মবাণী, সে পত্রিকা সাত মাসের মধ্যেই সাত বছর আগে প্রকাশিত মানসী-র একত্রে শু হয়ে নাম ধারণ করে মানসী ও মর্মবাণী, সম্পাদক হন জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তণ লেখকদের প্রচেষ্ট াতেই প্রকাশিত হল কল্লোল (১৯২৩), উত্তর - রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের একটা আভাস সে পত্রিক ার প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। সে সময় আধুনিকতার প্রশ্নে, পক্ষ - বিপক্ষের বাক্‌যুদ্ধে বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গণ মুখর হয়, এমন কি এই পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে কয়েকটি পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। এই সময়কালে, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনীর মুখপত্র হিসেবে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয় উত্তরা (১৯৫২) অতুলপ্রসাদ সেন নামাঙ্কিত এই পত্রিকার যাত্রা শু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর দক্ষ সম্পাদকতায় পত্রিকাটি বাঙ্গালার বাহিরে বাঙালী প্রকা শিত একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রায় একচল্লিশ বছর কাল প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি পত্রিকা, বৈশাখে ধূপছায়া (১৯২৭) ও বিচিত্রা, (১৯২৭) এবং আষাঢ়ে প্রগতি (১৯২৭)। প্রগতি প্রকাশিত হত ঢ াকা থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিত কুমার দত্তের সম্পাদনায়, আর বিচিত্রা-র রাজকীয় আবির্ভাব সর্বগোষ্ঠীর পত্রিকা হিসেবে একটা নতুন চির পরিচয় এনে দিয়েছিল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। একই বছরে ভাদ্র মাস থেকে স াপ্তাহিক শনিবারের চিঠি নবপর্যায় মাসিক রূপে পুনঃপ্রকাশ ঘটে। সজনীকান্ত দাসএর নেতৃত্বে অতিআধুনিক সা হিত্যিকদের কঠোর সমালোচনাকে তাঁরা অচিরকালের মধ্যে স্থায়ী আদর্শ মনে করেছিলেন। শনিবারের চিঠি-র সমস ামায়িক প্রতিপক্ষ, পক্ষ এবং নিরপেক্ষ নানা ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির নাম ধূপছায়া (১৯২৮), মহাকাল (১৯২৯) রবিবারের লাঠি (১৯২৯), বিদূষক (১৯২৯)। ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপাত্মক রচনায় কোনো কোনো পত্রিকা পাঠকমহলে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করত, সেদিক থেকে সাপ্তাহিক অবতার (১৯২৩), দুর্মুখ (১৯২৫) হসন্তিকা -র (১৯২৮) পরে অবশ্যই অচলপত্র (১৯৪৮), যষ্টিমধু-র (১৯৫২) নাম উল্লেখ করতে হয়, সে ধারাটি অবশ্য দীর্ঘদিন সাময়িকপত্র জগতে অনুপস্থিত বলা যায়। ইতিমধ্যে কল্লোল -এর ভাঙনের ফলে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত হয়েছে কালি - কলম (১৯২৬)। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে প্রকাশিত বিজলী সম্পাদনা করতেন নলিনীকান্ত সরকার, সেই পাক্ষিক ১৩৩৩ - এর বৈশাখ থেকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ -এর সম্পাদনায় মাসিক রূপে প্রকাশিত হতে শু করে। বঙ্গবাসী (১৯২২), অ াত্মশক্তি (১৯২২), পুষ্পপাত্র (১৯২৭) পত্রিকাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবি করে।

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকের শেষ দু-তিন বছর সাময়িক পত্রিকা জগতে কিছুটা হতাশার ব্যাপার ঘটে, ১৯২৭ -এ বন্ধ হল প্রগতি। তৃতীয় বর্ষের পঞ্চম সংখ্যাই (কার্তিক ১৩৩৬) তার শেষ সংখ্যা। পরবর্তী দু- মাসের মধ্যেই কল্লোল -এর অবসান হল (পৌষ ১৩৩৬) নবম সংখ্যায়, সপ্তমবর্ষ সম্পূর্ণ না করে। বেশ কিছুদিন অনিয়মিতপ্রকাশের পর কালি - কলম উঠে গেল ১৯৩০ -এর জানুয়ারিতে। তিরিশের সূচনাতেই অবশ্য এইসব বিলুপ্তির পর,কতগুলি সাময়িক পত্রিকার আ বির্ভাব ঘটে। নিঃসন্দেহে সে সবের প্রথম সারির নাম পরিচয় (১৯৩১) এবং বছরের ব্যবধানে আর একটি ঘটনা ঘটল, বিলুপ্ত কল্লোল, কালি-কলম আর প্রগতি-র স্থান পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ -এর বৈশাখে ত্রিপুরার একটি প্র াচীন শহর কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হলে পূর্বাশা (১৯৩২), কিন্তু বারোটি সংখ্যা প্রকাশের পর, সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেটিকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন, তখনকার তণ লেখকরা তাঁকেবিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন। পূর্বাশা প্রক াশের পর কয়েকমাসের মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় (১ নভেম্বর ১৯৩৩) একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশ নামে একটি স াপ্তাহিক পত্রিকার বিষয়ে জানানো হয় আগামী ১ অগ্রহায়ণ (ইং ১৭ নভেম্বর) ইইতে / দেশ নামে একটি সচিত্র সাপ্তা হিক পত্রিকা / প্রতি শুত্রবার প্রকাশিত হইবে / এই পত্রিকা / রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, খেলাধূলা/ অ ামোদপ্রমোদ প্রভৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট লেখকদের/ প্রবন্ধ সম্ভারে পরিপূর্ণ থাকিবে / সুলিখিত গল্প ও কবিতা পাঠকবর্গের অ ানন্দ বর্ধন করবে। পরবর্তী ষাট বছরের অধিকসময় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, প্রচার, পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে দেশ পত্রিকা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। প্রবাসীর পর দেশই একমাত্র পত্রিকা যা বাঙালির সাহিত্যচি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ

ভূমিকা পালন করেছে। একথাঅস্বীকার করার উপায় নেই। সে সময়ে সাময়িক পত্রিকার কোনো অভাব ছিল না--- সাপ্তাহিক বসুমতী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী পত্রিকাগুলি তখন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ। চল্লিশের প্রায় শু থেকে সাগরময় ঘোষ -এর নাম সহকারী সম্পাদক হিসেবে মুদ্রিত হলেও ১৯৭৬ থেকে তিনি সম্পাদক পথে বৃত হন, এই সময়সীমায় অবশ্য প্রকাশ্যে তাঁর নাম ঘোষিত না হলেও নেপথ্য নিয়ন্তার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনিই। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকের শু থেকেই, নতুন সাহিত্যযশঃপ্রার্থী তণদের কাছে স্বীকৃতির সোপান হিসেবেই দেশ পত্রিকা বিবেচিত হয়েছে।

।।৩ ।।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যবর্তী সময়ে, নিছক সংখ্যা পূরণের জন্য অতিকায় মাসিক পত্রিকাগুলি যেভাবে আগাছার অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়, স্বল্পায়তন সবুজপত্রকে সেদিক থেকে বাঁচিয়ে বঙ্গসাহিত্যকে কীভাবে পুষ্পিত করা সম্ভব সে বিষয়ে নজর দিয়েছিলেন সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় রচনার উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাংলার পতিত জমি মিলন ক্ষেত্রে পরিনত হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ত্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্য আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা, আশাকরি এ - বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে। বড়কে ছোটোর ভিতর ধরে রাখাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রচলিত পাঁচমিশেলি বা সর্ববহ পত্রিকার বিদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ শোনা গিয়েছিল সবুজপত্র প্রকাশের সতের বছর পর পরিচয় -এর আবির্ভাব ঘটেছিল, প্রথমাবধি তারও লক্ষ্য ছিল একটি নতুন লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলা। একদিকে সবুজ পত্র-র প্রাত্তন সদস্য যেমন কয়েকজন এসে মদত দিয়েছিলেন --তাঁরা ছিলেন, প্রধানত ব্যাখ্যাতা, বিশ্লেষণপন্থী, শিল্পী ততটা নন যতটা জ্ঞানী, রসের স্রষ্টা ততটা নন যতটা রসজ্ঞ, -- তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন আনকোরা একদল তণ লেখকও মিলিত হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ইচ্ছায়। পরিচয় -এর সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য যা উল্লেখ্য, তা তার সমালোচনা বিভাগ --- সম্পাদকের অসাহিত্যিক কয়েকজন বিদগ্ধ বন্ধুর সমাগমে তা সাধিত হত।

পরিচয় পত্রিকার কাছে তণ লেখকরা আবেদন জানিয়েছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা একেবারে নতুন না হলেও প্রতিষ্ঠার পথে নিজেদের একটা জায়গা করতে কেউ একজনকে সমালোচনা করতে দেওয়া হয়, না হলে সুবিচার সবসময় নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র মিত্রর প্রথমা কাব্যগ্রন্থ পরিচয় -এ সমালোচনার দায়িত্ব পান গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধদেব বসু নিজেই স্থির করেন একটা পত্রিকা প্রকাশ করবেন, যেটিতে কেবল কবিতা এবং কবিতাযিয়ক আলোচনা প্রকাশিত হবে। পরিচয় -এর বৈঠকে অন্নদাশঙ্কর -এর হাতে পোইট্রি নামাঙ্কিতএকটি কবিতাসর্বস্ব মার্কিণী - নমুনা দেখে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত কবিতা নামের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩৪২ -এর আশ্বিন-এ। বুদ্ধদেব অনুভব করেছিলেন, শুধু ছাপা হরফে কবিতা প্রকাশ মাত্র নয় আধুনিক বাংলা কবিতার জন্য একটা স্বতন্ত্র ও সম্মানজনক মর্যাদার আসন তৈরি করা দরকার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করাদরকার, শুধু গল্প প্রকাশের জন্য পত্রিকার সার্থক উদাহরণ গল্পলহরী (১৯১২), গল্পভারতী ঙ১৯১৫), গল্পগুচ্ছ (১৯২৭), আধুনিককালে, অর্থাৎ ষাট দশকের শেষের দিকে গল্প, বাংলা ছোটগল্প, গল্প বিচিত্রা, ছোটগল্প। ছোটগল্প নতুন রীতি নামে একটি আন্দোলনও সংগঠিক হয়েছে আলোচ্য দশকে। নতুন নিয়ম নামের পত্রিকাটিও একসময় তণগল্পকারদের মুখপত্র হিসেবেই প্রকাশিত হত। এ প্রসঙ্গে আজকের দিনে শুধু গল্পের জন্য গল্পগুচ্ছ পত্রিকার নাম উল্লেখ্য।

বুদ্ধদেব বসু সবুজপত্র -কে বাংলা ভাষার প্রথম লিটিল ম্যাগাজিন হিসেবে চিহিত করেছিলেন, কেননা তাতে বিদ্রোহ ছিল, যুদ্ধ - ঘোষণা ছিল, ছিল গোষ্ঠীগত সৌষম্য। তার মানে সাম্প্রদায়িকতা নয়, শুধু দীক্ষিতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা নয়। যেখানে সমধর্মীরা পরস্পরের মনের স্পর্শে বিকশিত হয়ে ওঠেন তাকেই বলে গোষ্ঠী, সেটা যখন ঘটে তখনই কোনো পত্রিকায় সবুজপত্রর মতো সুরের ঐক্য দেখা দেয়, চরিত্রের অমন অখন্ডতা, প্রকাশের অমন প্রথামুক্ত নির্ভয় ভঙ্গি। সর্ববহ পত্রিকার বহুল প্রকাশের প্রলোভন থেকে নিজেদের সরিয়ে এনে এক বিশেষ পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তির মধ্যে অদম্য উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্য চর্চায় নিযুক্ত থাকার প্রেরণা নতুন প্রজন্মের লোকরা অর্জন করেছিলেন সবুজপত্র থেকেই।

পরিচয় প্রকাশের সময় সুধীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাতে সবুজপত্র-র আবির্ভাব মুহূর্তের সময় মণিল াল গঙ্গোপাধ্যায়কে যে -পরামর্শ দিয়েছিলেন, স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে সেটির উল্লেখ করেছিলেন তিনি। প্রকাশিতব্য সাময়িক পত্রিকাটির চরিত্র নির্ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যারা ওজন দরে বা গজের মাপে সাহিত্যবিচার করে তাদের জন্যে এ কাগজ হবে না।সব লেখাই পয়লা নম্বরের হওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভিড় হয় না, অতএব আয়তন ছোট করতেই হবে। গল্প না দিলে মরণং ধ্রুবং, তবু বাড়াবাড়ি বর্জনীয়, অর্থাৎ গল্প স্বল্প হবে, এক গ্রাসে দুটো চারটে চলবে না। ছবি দেওয়া নিষেধ, বিজ্ঞাপনের বোঝাও পরিত্যজ্য, তার মানে মুনাফার লোভ থেকে দৃষ্টি যথাসম্ভব ফিরিয়ে আনা চাই। লোকসান জিনিসটা কারও পক্ষে প্রার্থনীয় নয়, তা হোক, ছোটো আয়তনের কাগজে ছোটো আয়তনের লোকসান সাংঘা তিক হবে না, এই ভেবে মনটাকে বেপরোয়া এবং কলমটাকে নিঃসংকোচ রাখাই ভালো। মণিলাল অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রস্ত াব মান্য করে রাজি হয়েছিলেন, তিনি জানিয়েছিলেন সে কাগজে ব্যবসার ছোঁয়াচ একটুও লাগবে না। সবুজপত্র বা পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক যাঁরা, প্রমথ চৌধুরী কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিত্তবান মানুষ ছিলেন, সাহিত্যপত্র প্রকাশে অর্থক্ষয় করবার ক্ষমতা নিয়েই তাঁরা সম্পাদনার দায়িত্বে হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিরিশের দশক থেকে বাংলা ভাষায় অন্য ধার ার অর্থাৎ সম্পূর্ণ অব্যবসায়িক যে সাহিত্যচর্চা ব্যাপকতা পেয়েছে তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মূলত লিটল ম্যাগাজিনের দ্বারা। বহুল প্রচারিত, ব্যবসায়িক সর্ববহ পত্রিকার পাঁচমেশালি উপকরণের বিদ্ধে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে এই সব পত্রিকার প্রয় াসে। প্রতিষ্ঠানের সচ্ছল পৃষ্ঠপোষকতা এড়িয়ে তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করেছিলেন।

।। ৪ ।।

বর্তমান শতাব্দির শুতে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে কয়েকটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও সে - সব পত্রিকায় সাহিত্য বিষয়টিকেও উপেক্ষা করা হয়নি শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৯০০) প্রকাশিত হত দুটি পৃথক অংশ, শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রাধান্য পেত বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন, অন্যদিকে আনন্দবাজার এ স্থান পেত রাজনীতি, সম াজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি। শ্রী গৌরাঙ্গ পত্রিকা (১৯০১) বৈষ্ণব ধর্মনীতি আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। বরিশাল থেকে প্রকাশিত হত ব্রহ্মবাদী (১৯০০)--- ব্রাহ্মধর্ম প্রচারই সে পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল, কিন্তু কবিতা ও প্রবন্ধও তার অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ। জীবনানন্দ দাশ -এর কবিতা প্রথমএই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়, তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ পত্রিকার প্রধান লেখক ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাতা কুসুমকুমারী -র বহু কবিতা এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে, মুসলিম সাময়িকপত্রগুলির কথাও উল্লিখিত হতে পারে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেষসময় থেকে শুকরে, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত যেসব পত্রিকা ধর্মীয় উদারতা কিংবা গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিলেও, তাদের মধ্যে প্রথমোত্ত শ্রেণির পত্রিকায় সাহিত্যকেও গুত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষ ভাবে। এবং অধিকাংশ পত্রিকাতেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদ ায়ের মানুষই অংশগ্রহণ করেছেন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে। নবনূর (১৯০৩), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮), সওগাত (১৯১৮), সাধনা (১৯১৯), মোসলেম ভারত (১৯২০), অভিযান (১৯২৬), সাহিত্যিক (১৯২৬), শিখা (১৯২৬) নওরোজ (১৯২৭), মাসিক মোহম্মদী, (১৯২৭), জয়তী (১৯৩০), ভারত (১৯৩৪) বুলবুল (১৯৩৪)। প্রথমটি বাদ দিয়ে এইসব পত্রিকার প্রায় সবকটির সঙ্গে কাজী নজল ইসলাম -এর সাহিত্যিক বিকাশের সংযোগ ঘটেছিল। বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশকে কাফেলা নামে একটি পত্রিকাও এই প্রসঙ্গে স্মতর্ব্য। প্রসঙ্গত সাময়িক পত্রিকাজগতে আর এক ধরনেব পত্রিকার কথাও উল্লেখ্য, বাঙালি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায় নিজেদের গুণকীর্তন ও গোষ্ঠী - সংব াদ পরিবেশনের জন্য অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলির নাম নমঃশূদ্র হিতৈষী (১৯১৬), সুবর্ণবণিক সমাচ ার (১৯১৬), তিলি সমাচার (১৯১৯), কর্মকার হিতৈষী (১৯২০), কংসবণিক পত্রিকা (১৯২৩), কায়স্থ পত্রিকা (১৯২৩), বৈদ্য প্রতিভা (১৯২৪) প্রভৃতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে, বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা সমসাময়িক ঘটনা। বিংশ শত াব্দীর শু থেকেই সাধারণ রঙ্গালয় বিশেষ জনাদর লাভ করে এবং লক্ষণীয় সাময়িক পত্রিকা নাট্যবিষয়কে নির্দিষ্ট করে প্রক াশিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রঙ্গালয় (১৯০১) পত্রিকার নাম, যদিও সেটিনিছক নাটকের পত্রিকা ছিলনা, রঙ্গভূমি নাট্যাভিনয় সম্বন্ধীয় অনেক কথার সঙ্গে, রঙ্গ রসের কথা, রাজার কথা, প্রজার কথা, আমোদ আাদের প

াশাপাশি দেশের কথা, দশের কথা ও সমাজের কথাও স্থান পেত। কিন্তু বাঙালির নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-র নাট্যমন্দির (১৯১০), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রঙ্গব্যঙ্গ (১৯১০), পরবর্তীকালে নাট্য-পত্রিকা (১৯১৩), থিয়েটার (১৯১৪) -এর ধারাতেই প্রকাশিত হয়েছে নাট্য - প্রতিভা (১৯১৮) নাচঘর (১৯২৪), শেষোক্ত পত্রিকাটিতে নাটকের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের বিষয়ে নানা সংবাদ আলোচনা স্থান পেত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন সংগঠনে নাট্যপত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নাট্য দলগুলির মধ্যে, এ বিষয়ে প্রায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে বহুরূপী গোষ্ঠী তাঁদের মুখপত্রটি বহুরূপী (১৯৫৫) নামে প্রকাশ করে। পরবর্তী চার দশক জুড়ে নানা ধরনের নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে কখনো নির্দিষ্ট দলের অধীনে, কখনো অন্যতর দল-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র আয়োজনে। অবশ্য বহুরূপী-র পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে গণনাট্য সঙ্ঘ-র মুখপত্র লোকনাট্য (১৯৪৯)। এর পরে নাট্যলোক (১৯৫১), গণনাট্য (১৯৫২) এবং নাট্য (১৯৫৪)। নানা ধরনের সম্পাদনার হাত বদলের পর এখনো বহুরূপী এবং গণনাট্য প্রকাশিত হয়ে চলেছে। গন্ধর্ব (১৯৫৯), রূপকার (১৯৬১), শৌভনিক (১৯৬৩), এপিক থিয়েটার(১৯৬৪), শূদ্রক (১৯৮১), আননায়ুধ (১৯৮১), সায়ক (১৯৯২) প্রভৃতি পত্রিকাগুলি যেমন সংশ্লিষ্ট দলের পৃষ্ঠপোষকতারয় প্রকাশিত হয়েছে, তেমন পাদপ্রদীপ (১৯৫৬), প্রসেনিয়াম (১৯৫৬), থিয়েটার (১৮৬৫), অভিনয় দর্পণ (১৯৬৮), অভিনয় (১৯৭০), গ্রুপ থিয়েটার (১৯৭৮), নাট্যচিন্তা (১৯৮১), স্যাস (১৯৮৪) প্রভৃতি পত্রিকা কোনো নির্দিষ্ট দলের অভিভাবকত্ব ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে। অঙ্গল, রঙ্গমঞ্চ কথাকৃতি, শুধু থিয়েটার বার্তা, সোনারপুর কৃষ্টি, একাঙ্গ পত্র, প্রয়াগ অসময়ের নাট্যভাবনা নাট্যান্বেষীপ্রভৃতি পত্রিকাগুলির মতো অনেক নাট্যপত্রিকা নানা সময় প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলির গুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ল্যুমিয়ের ভাইরা সর্বপ্রথম আমাদের দেশে তাঁদের ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। এর পরে, চলচ্চিত্র বিষয়ে একটা আগ্রহ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সাময়িক পত্রিকায় স্বভাবতই তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নাচঘর পত্রিকায় মূলত নাটকের প্রাধান্য থাকলেও, চলচ্চিত্রের বিষয়ে সমালোচনা প্রকাশ করে তারা বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন শুধু চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার নাম বায়োস্কোপ (১৯২৯)। এরপর প্রকাশ পায় দীপালী (১৯৩০)। সাপ্তাহিক বাঙলা (১৯২৩) ও সাপ্তাহিক নবশক্তি(১৯২৯) পত্রিকাতেও পৃথকভাবে চলচ্চিত্রকে গুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণবন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রলেখা (১৯৩০) নামে একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় ক্ষণজীবী একটি পত্রিকা চিত্রপঞ্জী (১৯৩১) প্রকাশিত হয়। এর দশ বছর পরে, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের জনপ্রিয়তা যখন ক্রমবর্ধমান, তখন কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রূপমঞ্চ (১৯৪০)। আন্তর্জাতিক আঙ্গিক কল্পনির্ঝর চিত্রবীক্ষণ, চলচ্চিত্র চিত্রবাণী, চিত্রকল্প, দৃশ্য চিত্রভাষ, চিত্রপট, প্রভৃতি পত্রিকা যেমন অব্যবসায়িকখবর, সিনেমা জগৎ, জলসা, ঘরোয়া এবং প্রসাদ, আনন্দলোক পত্রিকায় জনপ্রিয় কথাসাহিত্যের একটা ধারা তৈরি হয়েছিল। নবকল্লোল পত্রিকাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বেতার জগৎ পত্রিকাটি আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচির সঙ্গে সৃজনশীল প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যও প্রকাশ করেছে দীর্ঘদিন। সংগীত, নৃত্য নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিকপত্র সুন্দরম সাময়িকপত্র জগতে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।

সাময়িকপত্রের ধারাবাহিক বিবর্তনের সঙ্গে শিশু ও কিশোর বয়স্ক পাঠকদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলির ভূমিকা অবশ্য উল্লেখ্য। মনে রাখা দরকার, শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত, পূর্বোল্লিখিত দিগ্দর্শন মাসিকটি প্রকৃতপক্ষে কিশোরপাঠ্য সাময়িকপত্র, চারবছর পরে প্রকাশিত হয় পাবলী (১৮২২), যেটি খণ্ডশ প্রকাশিত হত। বিলাতি পেনি পত্রিকার আদর্শে বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি বয়স্কদেরও জ্ঞাতব্য বিষয়কে শিক্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করা হত। বিগত শতাব্দীর আর যেসব পত্রিকা অল্পবয়সী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলির মধ্যে নাম করতে হয় বালকবন্ধু (১৯৭৮), সখা (১৮৮৩), সখা ও সাথী (১৮৯৪), বালক (১৮৮৫), মুকুল (১৮৯৫) -এর। শেষোক্ত পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন আমরা মানব মুকুলদের হাতে সত্য জ্ঞানের মুকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুলে ফলে পরিণত হইবে। এই পত্রিকার আদর্শেই প্রকাশিত হয়েছিল পরবর্তী শতাব্দীতে শিশু (১৯১২) নামে একটি পত্রিকা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শু থেকে শিশু সাহিত্য রচনার যে নব - নব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিলল তার সবটাই তৈরি হয়েছে সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সন্দেশ -এর (১৯১৩), শিশু সাহিত্য বিষয়ে নানা

ধরনের পরীক্ষা - নিরীক্ষায় উপেন্দ্রকিশোর সহ তাঁর পরিবারের কৃতী সন্তানদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ সংযুক্ত হয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় -এর সময়ে এই পত্রিকাটি নতুনভাবে পরিকল্পিত হয়ে এখনো ছবি ও লেখায় বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে এটা সাময়িক পত্রিকা জগতে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একই সঙ্গে নাম করতে হয় মৌচাক (১৯২০), শিশুসাথী (১৯২২), রামধনু (১৯২২), মাসপয়লা (১৯২৯), পাঠশালা (১৯৩৬), রঙমশাল (১৯৯৭)। এই ধারাতেই পরবর্তীকালে আর একটা জনপ্রিয় পত্রিকার নাম শুকতারা (১৯৪৭)। শিশুসাহিত্যের প্রতি পাঠকগোষ্ঠীর আগ্রহের জন্য প্রবাসী পত্রিকাতে ছোটদের পাততাড়ি বিভাগের সূচনা হয় ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রগুলি সপ্তাহের একটি দিনে শিশুদের জন্য বিশেষ পাতা নিয়মিত করে দেয়। আজকের দিনে বহুবিখ্যাত আনন্দমেলা (১৯৭৪) পাক্ষিকটি, আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দমেলা (১৯৪০) বিভাগেরই ফলশ্রুতি বলা যায়। মাস পয়লা ভাইবোন, আগামী, শিশুমেলা, নবজাতক, সাতসমুদ্র, রোশনাই, ঝুমঝুমি, পক্ষীরাজ প্রভৃতি পত্রিকা স্থায়ী ভাবে প্রকাশিত না হলেও এক সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিশোর ভারতী (১৯৬৮), কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান (১৯৮৪) পত্রিকা বর্তমানে জনপ্রিয় কিশোর পাঠ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম।

।।৫ ।।

প্রবাসী ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলির পাঠক সম্প্রদায় যাঁরা, তাঁদের ধীরে ধীরেনতুন অভ্যাসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন দেশ-- সম্ভাবনাময় তণ লেখকদের প্রাধান্য দিতে শু করে পঞ্চাশের পর থেকে। ষাটের দশকের শুতে দেশ এর প্রতিপক্ষ সাপ্তাহিক হিসেবে যুগান্তর পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হতে থাকে অমৃত পত্রিকা। কিন্তু অস্বীকার করারউপায় নেই, চল্লিশের শু থেকে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যে একটা সর্বাত্মক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ - স্বাধীনতা প্রভৃতি ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিঘাতে যে জাতীয় সংকট দেখা দিয়েছিল। তা সত্তেও, সম্পাদকও লেখকগোষ্ঠীর একাগ্র প্রচেষ্টায় সাহিত্য সৃষ্টির নতুন স্রোত, ত্রমাগত ভিন্নতর পথের সন্ধানে গতি হারায়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশনা সাময়িকভাবে স্থগিত হলেও নবতর সম্ভাবনায় তার সৃজনশীলতা অব্যাহত থেকেছে।

তিরিশের মধ্যকাল থেকে চল্লিশের শেষ --এই সময়কালে অগ্রগতি (১৯৩৫), চতুরঙ্গ (১৯৩৮), অরণি (১৯৪১), সাহিত্যপত্র (১৯৪৮), দ্বন্দ্ব (১৯৪৭), সচিত্র ভারত (১৯৩৬), অগ্রণী (১৯৩৯), বর্তমান (১৯৩৬), সমসাময়িক (১৯৪০), ইদানীং (১৯৪৮), চতুষ্কোণ (১৯৪৯), কথাসাহিত্য (১৯৪৯), নতুন সাহিত্য (১৯৪৯) প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশে সংগ্রামী লেখক শিল্পীদের মনে যে সমাজ সচেতন মনোভাব প্রকাশ্যে সংগঠিত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব অগ্রণী, অরণি, প্রতিরোধ (১৯৪২) প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। মার্কসবাদী চিন্তাচেতনার প্রসার প্রগতিশীল সাহিত্য - সংস্কৃতিকে একটা নতুন মাত্রা দিতে সচেষ্ট হয়েছিল এই সময়ে প্রকাশিত অনেক কটি সাময়িকী। চিরকালই সমকালীন সাহিত্যিকরা সাহিত্যদর্শের বিতর্কে পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে দেখা দিয়েছেন, চল্লিশের থেকে দেখা যাবে রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত বিভেদ তীব্র আকার ধারণ করে। দক্ষিণপন্থী কিংবা বামপন্থী শিবির - বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠে -- তার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা দেয় পত্রপত্রিকার পারস্পরিক বিবাদের মধ্যে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে নন্দন (১৯৬৩) এক সময় প্রগতিশীল ভাবনার নতুন প্রবাহ তৈরি করেছিল। বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন কলেবরে মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

এ সময় আর একটি উদ্যোগ অবশ্য উল্লেখ্য । শুধু কবিতার জন্য একটি পর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতেথাকে কবিতা পত্রিকার প্রভাবে। প্রথমেই উল্লেখ্য, কবিতার দল ভেঙে তৈরি হল নিত্ত (১৯৪০)। তারপরে প্রকাশিত হয় একক (১৯৪১)। পঞ্চাশের শু থেকে এই তালিকায় যুক্ত হতে দেখা যাবে শতভিষা (১৯৫১), সীমানন্তে (১৯৫২), ময়ুখ (১৯৫২), কৃত্তিবাস (১৯৫৩) এবং কবিপত্র (১৯৫৮)। পরবর্তীকালে কবিতার পত্রিকা হিসেবেই সমধিক পরিচিত, কিন্তু উত্তরসূরি (১৯৫২) আরো একটি পাঁচমিশেলি পত্রিকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রথমে প্রকাশিত হয়। তারও পূর্বে সেটি প্রবন্ধসংকলনরূপে আবির্ভূত হয়েছিল ১৯৪৭ -এ, পরে ১৯৫৪ থেকে সেটি অবিমিশ্র কবিতা ও কলাচর্চার প্রবন্ধের জন্য দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পঞ্চাশের দশকের শেষপর্বে প্রকাশিত হয়েছিল অনুত্ত (১৯৫৬) --- পূর্বাশার প্রভাব ও স্বভাবকে তাঁরা গভীরভাবে অনুসরণ করেছিলেন। এই পত্রিকাতেই মরণোত্তর জীবনানন্দ-র কথাসাহিত্য - পরিচয় প্রথম উদঘটিত হয়। প্র

ায় সমসাময়িককালেই প্রকাশিত হয়েছিল মফঃস্বল শহর বহরমপুরের বর্তিকা (১৯৫৬), কলকাতা পরবর্তীকালে মফঃস্বলের সাহিত্যচর্চার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে অধুনা সাহিত্য, সাহিত্য সেতু, মোনালিসা, ডুলুং, শিস্, নৌকা, বনানী, বোবা যুদ্ধ, অতএব ভাবনা, উবু দশ, লালনক্ষত্র, গণকণ্ঠ, মধুপর্ণী, বনানী, অভিযান, সীমান্ত সাহিত্য, ত্রিবৃত্ত, ধানসিঁড়ি, ল্যাকেট্টু, নিমসাহিত্য, সুরঞ্জনা সৃজন, লোককৃতি, সম্প্রতি, সংবর্ত, প্রবাহ প্রভৃতি অজস্র পত্রিকা।

ষাটের দশকের শেষের দিকে কবিতার পত্রিকার এমনই একটা প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, তাতে কবিদের কাব্যগ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কাব্যপত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরিহাস করে লিখেছিলেন হাতের কাছে ফি-কবি পিছু এক-একটা লিটিল ম্যাগাজিন। ইতিমধ্যে পত্র - পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা কবিতা নিয়ে নানা ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। সমবয়স্ক কবিদের দলের সম্মিলিত আড্ডা এক অভিনব এবং দুরন্ত রূপ নেয়, বিশেষত কৃত্তিবাস - গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত কবিদের মধ্যে আত্মজৈবনিক আত্মকেন্দ্রিক রচনার উপকরণ ও অভিজ্ঞতার আকর্ষণে তাঁরা ক্রমাগত বেপরোয়া বোহেমিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এই বিপরীত দিকে অবশ্য শতভিষা-র অন্বেষণ এক বিশুদ্ধ কবিতার দিকে সংঠনের চেষ্টা দেখা দেয়। আবার এও লক্ষ্য করা গেল কৃত্তিবাস - পন্থীদের উড়নচণ্ডী উন্মাদনার ভেতর থেকে আর একটা উপদল গড়ে উঠল অচিরে --- অনেকটাই বিটনিকের প্রভাব সঞ্জাত সে আন্দোলন হাংরি জেনারেশন উপাধি ধারণ করে এক উন্মত্ততার জোয়ার এনেছিল সাহিত্যচর্চায়। হাওড়া থেকে প্রকাশিত সম্প্রতি (১৯৬২) নামক পত্রিকায় যার আভাস পরবর্তী তিন - চার বছরে, জেব্রা, উপদ্রুত, ক্ষুধার্ত, ফুঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বকাল, চিহ্ন, উন্মার্গ, ব্লুজ প্রভৃতি পত্রিকা প্রায় বিস্ফোরণের আকার নেয়। অবশ্য সে আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

সারা ষাটের দশক জুড়ে কবিতাকে কেন্দ্র করে নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে। শুতেই প্রকাশিত হয় মাসিক ধ্রুপদী (১৯৬০), পরে অলিন্দ (১৯৬৪), শেষোক্ত পত্রিকাটিতে শান্ত স্বরের কবিতার প্রাধান্য, যেন কবিতা নিয়ে হৈ - চৈ -এর বিদ্ধে কিছুটা প্রতিবাদ। তাতে অবশ্য হট্টগোল প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে, অকস্মাৎ কাব্যজগতে আরো ভয়ঙ্কর আকার দেখা দিয়েছিল, কবিতা সাপ্তাহিকী (১৯৬৬), দৈনিক কবিতা (১৯৬৬), সান্ধ্য কবিতা দৈনিক (১৯৬৬), এমনকি কবিতা ঘন্টিকী বা কবিতা শতবার্ষিকীর মতো পত্রিকার প্রকাশে। এসময় কবিতা নিয়ে এমন সব কাণ্ডকারখানা শু হয়েছিল যে, বুদ্ধদেব বসুর মতো আজীবন কবিতা অনুরাগী একে বিসূচিকার মহামারীর মতো প্রাদুর্ভাব বলে মন্তব্য করেছিলেন। এরকম উদ্ভুক্কেপনার বিদ্ধে অভিযোগ থেকেই প্রকাশিত হল সর্বদলীয় কবি সমাজের মুখপত্র ত্রৈমাসিক কবি ও কবিতা (১৯৬৬) এরই সমসাময়িক বাংলা কবিতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কবিতা পরিচয় (১৯৬৬) নামে একটি ভিন্ন চির পত্রিকার মাধ্যমে। আলাদা করে সুধু প্রবন্ধের জন্য সমকালীন (১৯৫৩), সাময়িকপত্রের ধারায় বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, এরপর প্রকাশিত হয় প্রবন্ধপত্রিকা (১৯৬০)। সব রকমের রচনা নিয়ে আবির্ভাব মুহূর্তেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক্ষণ (১৯৬১), প্রথমে দ্বিমাসিক, পরবতীকালে অনিয়মিত হয়ে পড়ে, কিন্তু তদানীন্তন অস্থির সময়ের মধ্যে এক্ষণ-এর মননচর্চা, বৈদগ্ধ্য ও সুশৃঙ্খল চির গুণে সাময়িক পত্রের ধারাবাহিতায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। কিছুদিন পরে প্রকাশিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৬৫) পত্রিকাটিও প্রবন্ধচর্চার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে, আজকের দিনেও তার যাত্রা অব্যাহত। প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রকাশে সে পত্রিকা সম্ভবত বিশ্বভারতী পত্রিকাকে (১৯৪২) আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রবীন্দ্রভারতী পত্রিকাটিও (১৯৬৩) দীর্ঘকাল প্রবন্ধের পত্রিকা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য দশকে সারস্বত (১৯৬৮) পত্রিকা, মুদ্রণচি এবং সুসমৃদ্ধ রচনায় মনন ও সৃজনশীলতার আধুনিক মাসিক পত্রিকা হিসেবে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল -- মুদ্রণব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়নি বলে পত্রিকাটি অকালে লুপ্ত হয়ে যায়। বারোমাস (১৯৭৮) পত্রিকার নামটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে অনিয়মিত কিন্তু প্রবন্ধ ও মৌলিক সাহিত্য চর্চায় অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এক সময়।

সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিষয়বৈচিত্র্যের দিকটিও উল্লেখ করা দরকার। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার কথা বাদ দিলেও, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, যৌনবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, শিক্ষা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার, রাজনীতি, খেলাধূলা, সংগীত, রহস্য ও গোয়েন্দা, প্রায় সব রকম বিষয়েই পৃথক পত্রিকা প্রকাশিতহয়েছে বিভিন্ন সময়ে। দর্শন, দর্শন ও দার্শনিক, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ঐতিহাসিক, ইতিহাস ও আলোচনা, আয়ুর্বেদ পত্রিকা, আযুর্বেদ হিতৈষিণী, আর্যপ্রতিভা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, হাকীম প্রভৃতি পত্রিকা সংশ্লিষ্ট আগ্রহী পাঠকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেছে বিভিন্ন

সময়ে। এক সময় প্রেততত্ত্ববাদীদের মুখপত্র হিসেবে অলৌকিক রহস্য নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। এ ঘটনাও উল্লেখযোগ্য স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রশ্নে বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কমলা পত্রিকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল নিরন্ন বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন যোগাইবার জন্য, বেকার লোকের কর্ম জুটাইবার জন্য, আমাদের আশেপাশে ধনরত্ন কোথায় কিরূপে আছে তাহার অনুসন্ধান ও তাহা কিরূপে পাওয়া যায় তাহার উপায় উদ্‌ভাবনের জন্য, আমাদের নষ্ট শিল্প - বাণিজ্য পুনদ্ধারের জন্য, কৃষিপ্রাণ ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য . . . এই পত্রিকার আবির্ভাব। ব্যবসা - বাণিজ্য, ব্যবসায়ী, স্বদেশী, কাজের লোক, কৃষিতত্ত্ব, কৃষি গেজেট, কৃষি সমাচার, কৃষি সম্পদ প্রভৃতি পত্রিকার গুত্ব তদানীন্তনকালে জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান বিষয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় পত্রিকা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জ্ঞান বিজ্ঞান। একসময় নরনারী, যৌবন বা নতুন জীবন সিনেমা আর যৌন জীবনকে সামনে রেখে ব্যবসা করেছে, ইদানীকালে ভ্রমণ বা ভ্রমণ সংবাদ পর্যটনাকাঙ্ক্ষীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বিষয়ভিত্তিক পত্রিকার প্রসঙ্গে মানবমন (১৯৬২) পত্রিকার নামোল্লেখ করা দরকার, ষাটের দশকের প্রথমভাগে পত্রিকাটি আভির্ভূত হয়ে পরবতী ছত্রিশ বছর মনোবিদ্যাচর্চার পাশাপাশি দর্শন, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বিষয়েও অনেক মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পত্রিকার ভূমিকা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত। অঙ্কভাবনা, ধাঁধা, ফটোগ্রাফি চর্চা প্রভৃতি পত্রিকার নামেই তাদের বৈশিষ্ট্য চিহিত।এই বিষয়ভিত্তিক সাময়িপত্রের তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন বাংলা বই (১৯৯৯), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয়ে একটি মাসিক আলোচনাপত্র। এ প্রসঙ্গে ক্ষণজীবি সাম্প্রত পত্রিকাটিরকথা আমাদের অবশ্যই স্মরণ করা দরকার, গ্রন্থপঞ্জি কিংবা রচনাপঞ্জি প্রকাশ করে এক সময় অনেক গুত্বপূর্ণ কলেজষ্ট্রিট নামের পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে অন্যতম, কলকাতার বইপাড়ার প্রকাশকদের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখ করা দরকার যান্মান্নিক বার্তা প্রকাশিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশক সভার উদ্যোগে, এছাড়াওবঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিত্রেতা সভা প্রকাশ করেন গ্রন্থজগৎ, পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ডের বাংলা মুখপত্রের নাম পুস্তকমেলা।

ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে শ্রুতি (১৯৬৫) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা নতুন রীতির কাব্যচর্চা উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল, যেমন এই দশক (১৯৬৬) পত্রিকার লেখকরা গড়ে তুলে ছিলেন নতুন রীতির গল্প আন্দোলন। সমসময়ে সাম্প্রতিক (১৯৬৬) পত্রিকার কবিদের উদ্যোগে সংগঠিত হয় ধবংসকালীন কবিতা আন্দোলন। বলা যায়,ষাটের শেষার্ধে নানা ধরনের অজস্র পত্র - পত্রিকার আবির্ভাব সত্তরের দশকে এসে প্রায় বিস্ফোরণের চেহারা নেয়। সত্তরের দশকে শহর ও মফঃস্বলের পত্র - পত্রিকার পারস্পরিক ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য গঙ্গোত্রী, কিংবা আত্মপ্রকাশ প্রত্রিকার পাশাপাশি জামশেদপুরের কৌরব, কুচবিহারের ত্রিবৃত্ত অনেক ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। লিটল ম্যাগাজিনের অস্তিত্ব ও তার প্রবহমানতার গুত্ব উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ ব্যত্তিগত উদ্যোগে কলকাতায় লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ্য ঘটনা।

।।৬ ।।

ব্যবসায়িক পত্রিকার পাশাপাশি এই ব্যতিত্রমী পত্রিকার ধারা সবুজপত্র-র সময়ে প্রথম নতুন মাত্রা পেয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রথম চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার আর্বিভাব মুহূর্তে অত্যন্ত সচেতনভাবে ব্যবসায়িক পত্রিকার কাছ থেকে যেসব বিষয়ে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছিলেন সাহিত্য এদেশে অদ্যাবধি ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি । তার জন্য দোষী লেখক কী পাঠক, বলা কঠিন। ফলে আমরা হচ্ছিসব সাহিত্যসমাজের শখের কবির দল। অব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোনো কাজই যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না, এ কথা সর্বলোক স্বীকৃত। লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে কাজও নয় খেলাও নয়, শুধু অকাজ, কারণ খেলার ভিতর যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, লেখায় তা নেই, অপরদিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে, তাও তাতে নেই। আমাদেরর রচনার মধ্যে অন্যমনস্কতারপরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়, কেননা যে অবসর আমাদের নেই সে অবসরে আমরা সাহিত্য রচনা করি। আমরা অবলীলাত্রমে সাহিত্য গড়তে চাই বলে আমাদের নৈসর্গিকী প্রতিভার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। অথচ এ কথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যিনি সরস্বতীর প্রতিঅনুগ্রহ করে লেখেন, স্বরস্বতী চাই কি তার প্রতি অনুগ্রহ ন

াও করতে পারেন। ব্যবসায়িক সাময়িকপত্রের ধারায় দেশ পত্রিকা সৃজনশীল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রচারে অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করে একইসঙ্গে বাণিজ্যিক সাফল্য ও কালোত্তীর্ণ সম্ভার পরিবেশন করে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
যাঁরা সাহিত্যের সৃজনশীল লেখক, তাঁরা অনেক সময় সাময়িকপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন, কিন্তু যে সম্প াদক হিসেবে অন্যের লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারেন তা নয়। ফলে পত্রিকার সম্পাদনার দা য়িত্ব, কিছুদিন পরে ছেড়ে দিতে হয়। বঙ্গদর্শন সম্পাদনার কালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন ইউরোপীয় স াময়িকপত্রে এবং এতদ্দেশীয় সাময়িকপত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে যিনি সম্পাদক,তিনিই প্রধান লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটন মাত্র - স্বয়ং বরকর্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন নাই। রবীন্দ্রনাথও অনেকটা একই সুরে ভ ারতীয় সম্পাদনা কর্ম থেকে বিদায় নেওয়ার সময় প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠস্বরেরইপ্রতিধবনি করে বলেছিলেন পত্রের অধিক াংশ নিজের লেখার দ্বারা পূরণ করিবার মত যাহার প্রচুর অবকাশ ওক্ষমতা নাই, নিয়মিত পরের লেখা সংগ্রহ করিবার মত অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় নাই, এবং ছাপাখানা ইত্যাদির সর্বপ্রকার সংকট নিবারণ যাহার সাধ্যের অতীত তাহার পক্ষে সম্পাদকের গৌরবজনক কাজ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহু বামনের চেষ্টার মত হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই একেবারে আধুনিককালে মহানগর, শিলাদিত্য, অমৃত, বা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত কৃত্তিবাস পত্রিকা বাণিজ্যিক স ার্থকতা অর্জন করে নি বা দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের অধিকারীহয় নি, যদিও অনেক সময় এসব পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সমকালে জনপ্রিয় ও ব্যস্ত লেখকরা। তবে একথাও ঠিক, সৃজনশীল লেখক না হলে, সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করা সহজসাধ্য হবে এমন ভাবার কোনো কারন নেই, সর্ববহ জনমনোরঞ্জনী পত্রিকা গত দশ - পনেরো বছরে কম প্রকাশিত হয় নি, বিপুল অর্থব্যয়ে মুদ্রণ প্রযুক্তিরব্যাপক কল্যাণে দৃষ্টিনন্দন চোখ - ধাঁধানো সেসব পত্রিকা শেষপর্যন্ত সবকটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।
সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) নারী সমাজের নানাবিধ সমস্যাগুলি সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত সাধারণ মানুষ বিশেষত স্ত্রীলোকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। সেই ধারাতেই প্রকাশিত হয়েছিল বামাবোধিনী, অবলাবান্ধব, বঙ্গমহিলা, বঙ্গবালা, পরিচারিকা, মহিলা, অন্তপুর প্রভৃতি পত্রিকা। মেয়েদের সমস্য াগুলিকে যেমন পুষরা অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে দেখেছিলেন, তেমন মেয়েদের মধ্যে অনেকেই এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা প ালন করেছিলেন। একটা জিনিস আমাদের অনেক সময় মনে থাকে না, নারীদের পত্রিকা বলতে কেবল নারীদের সম্পাদন ায় প্রকাশিত পত্রিকাকেই বোঝায় না, পুষরাও সচেতনভাবে নারীকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে অনেক গুত্বপূর্ণ নারী বিষয়ক পত্রিকার প্রবর্তনা করেছেন সার্থকতার সঙ্গে। সাম্প্রতিককালে সখীসংবাদ বা খোঁজ নামের দুটি পত্রিকার উল্লেখ করা য ায়, যেগুলি মহিলাদের বিষয়ে প্রধানত মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মূলত অর্থনৈতিক কারণে তাদের প্রকাশ সব সময় বিঘ্নিত হয়েছে, প্রথমটি দীর্ঘকাল লুপ্ত, দ্বিতীয়টি অনিয়মিত কিন্তু সম্পাদিকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে এখনো প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এসব পত্রিকার পাশে, বিপুল অর্থ ব্যয়ে সুকন্যা, কিংবা সানন্দা, মনোরমা কিংবা আলোকপাত ---পাঠক ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের বিপুল আয়োজন নিয়ে অনেক দিন ধরে বাণিজ্য করে চলেছে। এর পাশাপাশি সংবাদ ও সা হিত্যকে একই সঙ্গে বাণিজ্যের উপকরণ করে বেশ কিছু পত্র - পত্রিকা প্রকাশিত হলেও-- পাঠকরা সেগুলি প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করেনি। কালো টাকা সাদা করবার সহজ উপায় হিসেবে, পত্রিকা ব্যবসার পথে পসার জমানোর উচচাশা নিয়ে এক ধরনের চতুর, অনভিজ্ঞ, অসাধু মানুষ শেষপর্যন্ত যে কৃতকার্য হতে পারে নি, সেটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সৌভ াগ্যের ব্যাপার।
অস্বীকার করার উপায় নেই, সর্ববহ সাময়িক পত্রিকার মূল ধারাটি দীর্ঘকাল ধরে লুপ্ত বলা যায়, তুলনায় লিটল ম্যাগা জিনই গত পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম বাহন হিসেবে কাজ করে চলেছে। অথচ আশির দশক থেকে, সেই অন্যতর ও সুফলপ্রসূ প্রবাহটি নানাদিক থেকেই স্তিমিত, সৃজনশীল সাহিত্যের কিংবা বাঙালি মননশীলত ার মৌলিকত্বের আজ তার তেমন প্রাণবন্ত উৎসার নেই --- এমন অভিযোগ আজকাল প্রায়ই শুনতে হচ্ছে। এর প্রধান ক ারণ, সাময়িকপত্র সংগঠনের ক্ষেত্রে কেটা সর্বাত্মক নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে শতাব্দীর সর্বশেষ দশকে।
স্মরণ করা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য য াদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ১৯৮১ -র ২৮ এপ্রিল একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, সেই উপলক্ষে একটি স্ম

ারক পত্রিকায় সম্পাদকের সাক্ষাৎকার সংকলিত হয়। এই উপলক্ষে উদ্যোক্তারা তাঁদের উদ্দেশ্য বিষয়ে সংক্ষেপে জানান

বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা আজ সীমাহীন। তাদের চেহারা, চালচলন, চরিত্রও রকমারি। আকারে আয়তনে অঙ্গ সজ্জায় এবং বিষয় - প্রসঙ্গে এদের অনেকেই বিশিষ্ট। বড়ো বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলিরপাঁচমিশেলি রঙিন কোলাহলের পাশ াপাশি, বা তাদের থেকে একটু গা বাঁচিয়ে, এসব ছোট কাগজ বেরোচ্ছে, দম নিচ্ছে, মরে যাচ্ছে, কখনো বা ফের বেঁচে উঠছে। এদের পাঠকসংখ্যা কম, কিন্তু যারা পাঠক তারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আর এদের লেখক? সম্পূর্ণ অচেনা - অজানা নতুন লেখক বেশিভাগ সময়ে লেখা ছাপানোর সুযোগ পান এসব কাগজেই। সেখানে লিখতে পারেন নিজের খুশিমতো, প্রতিবাদ করতে পারেন চোখ রাঙিয়ে বা হাত - পা ছুঁড়ে।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে, বিগত তিরিশ বছরের সময়কালে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে চৌত্রিশটিকে তাঁরা নির্বাচনযোগ্য মনে করেছিলেন , দশক বা বিষয় অনুসারে না সাজালেও পাঠক সাধারণের কাছে সেসব পত্রিকার নাম অচেনা নয়। বর্ণ ানুক্রমিক বিন্যাসে সেগুলির তালিকা দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, প্রথম বিভাগে অনুক্ত,, অন্যমনে, এইদশক, এক্ষণ, কবিকণ্ঠ, কবিপত্র, কবিতা সাপ্তাহিকী, কলকাতা, কৃত্তিবাস, দৈনিক কবিতা, প্রমা, শতভিষা, সখী সংবাদ বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কাজ মৌখিকভাবে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সম্পাদকেরা। দ্বিতীয় গুচ্ছে, সম্পাকরা লিখিতভাবে জানিয়েছেন তঁ াদের পত্রিকার কথা, সেগুলি হল অনীক, অনুষ্টুপ, অলিন্দ, আবর্ত, উচচারণ, উৎস মানুষ, কবি ও কবিতা, কালপুষ, গ াঙ্গেয়পত্র, চতুষ্কোণ, নান্দীমুখ, পরমা, প্রবন্ধ পত্রিকা, প্রস্তুতি, বহুরূপী, বিভাগ, মহারাজ, ম্যানিফেস্টো, শুকসারী, স্পন্দ, হীনযান। এ সব পত্রিকার মধ্যে সবকটি যে অবিমিশ্র সৃজনশীল সাহিত্যর বাহন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, বিশেষ কে ানো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বা মতবাদের প্রচারকেও প্রাধান্য দিয়েছেন উদ্দেশ্য হিসেবে। মনে হতে পারে এই তালিকায় নির্বাচনের ব্যাপারে আয়োজকদের একটা পক্ষপাত আছে, কিন্তু তাঁরা নিজেদের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে জানান লিট্ল ম্যাগাজিন যেভাবে বেরোয় কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে, অল্প কিছু মানুষের শখ মর্জি পাগলামি বা খেয়ালখুশির অন্তরঙ্গ স্পন্দনকে ছাপার অক্ষরে তুলে ধবতে, এই প্রদর্শণীর এবং সংকলনের আয়োজনও তেমনি। এ আয়োজন সেসব অর্থেই অসম্পূর্ণ, উদ্যোক্তারা তা জানেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, যে কোনো অতিসচেতন ব্যক্তির পক্ষেও বিশাল ধ ারাবাহিকতার অনুযায়ী পত্র - পত্রিকাতর দীর্ঘতালিকা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সমসাময়িককালে এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ হলেও আরো প্রসারিত হতে পারে, আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকার নামের সংযোজনে, যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথমত, সত্তরের কবিতা, চান্দ্রমাস, কয়েকজন, গল্পকবিতা, কণ্ঠস্বর, রাজধানী, অন্তরীপ, অন্যদি, অন্ধযুগ, সুমেরীয়, বেলা অবেলা, চিল, এখন নিদাঘ, লা-পোয়েজি, এবং নৈকট্য, জর্নাল সত্তর, নবাহ, বাংলা কবিতা, মাসিক বাংলা কবিতা, ষ াটের দশক, বাল্মিকী, পিলসুজ, মধ্যাহ্ন, শব্দমন্দ্র, সমরানুগ, দর্শক, সুমেকুমে, গাঙ্গেয়পত্র, শতরূপা, সিন্ধুসারস, মহ াপৃথিবী, স্মরণাক্ষর, পত্রপুট প্রভৃতি। রবীন্দ্রজন্মোৎব উপলক্ষে প্রকাশিত হয়ে পঁচিশে বৈশাখের কবিতা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, যেমন এক সময় বাংলাভাষায় মিনি পত্রিকার একটা ঢল নেমেছিল, এমন কি তার বিপরীতে বিনি পয়সায় বিনি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে দেখা গিয়েছিল।

তিরিশের মাঝামাঝি সময়ে কবিতা নামের যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, পঞ্চাশের প্রথম দিকে পৌঁছে, আঠারো বছরের পরমায়ু অতিক্রম করার পর এসব পত্রিকা দীর্ঘজীবী হতে পারেন না, কিন্তু সেটা আংশিক সত্য। স্বল্পায়ুতাই এদের চরিত্রলক্ষণ। বিশেষ কোনো একটি কাজ নিয়ে এরা সঞ্জাত হয়ে, এবং সেটুকু সম্পন্ন হলেই এদের তিরোধান ঘটে। সেটাই শোভন, সেটাই যথোচিত। ইদানীং কবিতা হয়তো সেই শোভনতার সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে,এ কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমি অস্বস্তি বোধ করি। আজকের দিনে অবশ্য নিছক কোনোরকম টিকে থাকা ছাপার হরফের যেনতেন প্রকারেণ নিজের অস্তিত্বের পরিচয়টুকু বহন করাকেই অধিকাংশ সম্পাদক পরমায়ু বা জীবন বলে মনে করেন। প্রতিবছর বিজ্ঞাপন- শিক ারের প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতায় নেমে কেবল বয়স বাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে ইতিহাসের অমরত্ব অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টাই অ াজকের সাময়িকপত্রচর্চার প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

।। ৭ ।।

তিরিশের দশকে পূর্বাশা সম্পাদনাকালে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদকীয় মন্তব্য করে লিখেছিলেন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পা

ক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক সব মিলিয়ে পত্রিকার সংখ্যা কিছু কম নয়। এরপর আর দেশের দারিদ্র্যের দোহাই দিলে চলে না--- বিশেষ করে, যখন সিনেমার পত্রিকাই আছে দশ-বারো। অসংখ্য পত্রিকার ভার বহন করতে হচ্ছে ভাষাকে। অথচ ভাষা ফেলেছে সাহিত্যকে হারিয়ে, পত্রিকা আছে, সাহিত্য নেই। আজ দীর্ঘ ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যচর্চার সীমাবদ্ধত ার দিকে তাকিয়ে এ কথার যাথার্থ্য নতুন করে অনুভব করা যায়। তবু, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সফল ও সমাদৃত ছোট পত্রিকার তালিকাটি নাতিদীর্ঘ হলেও, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার নানামুখ তাঁরাই সঞ্জীবিত রেখেছেন। অনুষ্টুপ, বিভাব, প্রমা, কবিপত্র, সীমান্ত, পরিচয়, চতুষ্কোণ, বারোমাস, বহুরূপী, জিজ্ঞাসা, অব্যয়,সমতট কালপ্রতিমা, কৌরব, অমৃতলোক, প্রভৃতি পত্রিকার পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছে কবিতীর্থ, দিবারাত্রির কাব্য,কবিকৃতি, রক্তমাংস, বিজ্ঞাপন পর্ব, দাহপত্র, কড়ি ও কে ামল নবান্ন, চেতনা, কবিতা পাক্ষিক, এখন মুক্তাক্ষর, সুন্দর, পত্রপুট, একালের রক্তকরবী, মাঝি, গল্পগুচ্ছ, অনীক, জলার্ক, মহাদিগন্ত, অর্কিড, সত্তর দশক, এবং উপকণ্ঠ যোগসূত্র, শেষোক্ত পত্রিকা দুটি দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয় না। পুরাতন ময়ুখ, নবপর্যায়ের প্রকাশিত হয়েও, নব প্রকাশিতদারোগারোড -এর মতো দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। কৌশিকী কিংবা বিতর্কিকা নতুন উদ্যমে প্রকাশিত হয়ে সাময়িক পত্রিকারএকটি উল্লেখযোগ্য ধারার পুনঃ প্রবর্তন করেছে। এই দশকেই আখ্যান নামের একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েচে সমকালীন কথাসাহিত্য বিষয়ে নতুন আলোচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। ষোল বছর ত্রৈম াসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়ে প্রমা মাসিক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে গত চার বছর। সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে, তথ্যকেন্দ্র, বিনে াদন বিচিত্রা, দিশাসাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা, বাণিজ্যিক সাময়িকীর আদলে। এই প্রচেষ্টার সার্থকতার অন্যতম উদ াহরণ হিসেবেপ্রতিক্ষণ ও পরিবর্তন পত্রিকার কথাও উল্লেখ করা যায়।

আজকের দিনে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে নতুন একটি প্রবণতা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে---কয়েক বছর ধরে এক-একটি পত্রিকা বিশেষ সংখ্যার আয়োজন করায় মনোযোগী হচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সত্তরের দশকের শুতে অধুনালুপ্ত অন্বিষ্ট পত্রিকা এ ধরনের উদ্যোগে বিশেষ সাফল্য পেয়েছিল। গত কয়েক বছরে কোরক, এবং মুশায়েরা, এবং জলার্ক, এবং প্রতর্ক এবং এই সময়, শিলীন্ধ্র, ঐকতান, উত্তরাধিকার লোকসংস্কৃতি গবেষণা, প্রচ্ছায়া,, শব্দ শাব্দিক, মুখ, হাওয়া ৪৯, লৌকিক উদ্যান, পরিকথা, পর্বসন্ধিপ্রভৃতি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার দৃষ্টান্ত সাময়িকী প্রকাশে নতুন প্রভাব তৈরি করেছে। এই বিশেষ সংখ্য ার উদ্যোগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন - অর্জনের সাফল্যকেই সবচেয়ে গুত্ব দেওয়া হয়। সম্প্রতি ধ্রুবপদ পত্রিকা এ বিষয়ে অভিনব আদর্শ স্থাপন করেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বিশেষ সংখ্যায় কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ না করে। এ প্রসঙ্গে সরকারী পৃষ্টপোষকতায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ, যুবমানস চাকলা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, গণদর্পণ শিক্ষাদর্পন বাংলা অ াকাদেমি পত্রিকা, লোকশ্রুতি প্রভৃতি পত্রিকাগুলির নাম উল্লেখ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রগুলি কলকাতা হলেও, বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চর্চায় দীর্ঘদিন ধরে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছে হাইলাকান্দির সাহিত্য, কানপুরের খেয়া, রাঁচির পদক্ষেপ, ত্রিপুরার নান্দীমুখ, বাংলা কবিতা, জামশেদপুরের কৌরব, আসামের পূর্বদেশ, দিল্লির উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস, প্রৈতি কাছাড়ের অরূপবীণা, মহারাষ্ট্রের খনন প্রভৃতি পত্রিকা। ভারতের বাইরে এসেক্স থেকে সাগরপারে এবং আন্দামান থেকেদীপান্তর পত্রিকাদুটির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

স্মরণ করা যেতে পারে, সত্তরের শেষের দিকে লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদকরা পারস্পরিক ঐক্য সংহতি সংগঠনে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, মূলত অর্থনৈতিক স্বচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে। বিশেষত সরকারি বিজ্ঞাপন বন্টনের বিদ্ধে প্রতিবাদ করবার কারণেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তাঁরা। এমন নয় যে, সে উদ্যোগে তাঁরা পত্রিকা সম্পাদনার মানোন্নয়ন, লেখক কিংবা পাঠকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। অথচ আমরা জানি, সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের বলের সঙ্গে লেখক - গোষ্ঠীর মিলন না - হলে কোনো সার্থক সাময়িকপত্রকে দীর্ঘজীবী করা সম্ভব হয় না। বুদ্ধদেব বসুর কথার প্রতিধবনি করতে হয় যাঁরা মিলবেন তাঁদের প্রাণের টানে মেলা চাই, কর্তব্যবোধে বা জীবিকার তা গিদে নয়। তা না হলে মিলন হয় না--- যদিও সম্মেলন হতে পারে, গোষ্ঠী হয় না, শুধু ভিড় হয়।

শতাব্দীর শেষপাদে, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি উদ্যোগ নিয়েছিল, লিটল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত করে পারস্পরিক পত্রিকা গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সম্মিলিত প্রয়াস সংগঠনের । আকাদেমি এই উপলক্ষে গত বছর বাংলা লিটল ম্যাগাজিন তথ্যপঞ্জি নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, সে পুস্তিকায় কলকাতাসহ আঠারোটি জেলায় ৫৭৮-টি পত্রপত্রিকার তালিকা মুদ্রিত হয়েছে, তাতে বর্তমান দশকের নব প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়ছে ৩৩৭। দেখা যায়, ১৯৯০

-এর পরে কলকাতায় ৯৪ টির পাশাপাশি, নদীয়াতে ৪৫ টি, চবিবশ পরগণা উত্তর- দক্ষিণ মিলিয়ে ১৪ ও ১৯ - টি, মেদিনীপুরে ২২ টি, বর্ধমানে ১৮টি, পুলিয়ায় ১৬টি, বীরভূম- হুগলিতে ১২টিকরে, জলপাইগুড়ি - হাওড়াতে ৮টি করে, বাঁকুড়ায় ৭-টি , কোচবিহারে ৪টি, দিনাজপুর পশ্চিম এবং দক্ষিণ যথাক্রমে ১ ও ৩-টি। মালদহ ও দার্জিলিং -এ পত্রিকার সংখ্যা ৫ ও ৩টি। বলাবাহুল্য, আগত শতাব্দীর হাতে এই অর্ধ - সহস্রাধিক , পত্রিকায় বাহিত সাহিত্যচর্চার উদ্যম ও সাফল্য অনেকটাইনির্ভর করবে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস আজ লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসেই পরিণত হয়েছে, কেননা আজকের দিনে বাণিজ্যিক পত্রিকার উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ, সে ধারার অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত বলা চলে। আবার কেউ কেউ মনে করেন লিটল ম্যাগাজিনের প্রকৃত চরিত্রের ও বৈশিষ্ট্যের এতটাই বদল হয়ে গেছে যে আজকের দিনে তার সংজ্ঞাও নতুন করে স্থির করা দরকার। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধদেব বসু কিংবা সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছোটো পত্রিকার সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, আজকের দিনে তাঁদের কর্মপদ্ধতিকে নতুন দিনের প্রেরণা মনে করে এগুতে হবে। সারাজীবন সাময়িকপত্র সম্পাদনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কখনো নিজের উচচাশা পূরণকে প্রাধান্য দেননি, বেতনের বিনিময়ে সম্পাদিত পূর্বাশা - কে শোভন ও উন্নত রুচির চেহারায় সাজানো প্রতিশ্রুতি পেয়ে বিত্তবানের মুদ্রণালয়ে নামমাত্র কর্ম সংস্থান গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, লিটল ম্যাগাজিনের প্রবাহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে হলে বুদ্ধদেব বসু প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে বীজমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হব, তিনিই প্রথম ছোটো বিশেষণের অর্থ বুঝেছিলেন প্রথমত, কথাটা একটা প্রতিবাদ একজোড়া মলাটের মধ্যে সব কিছুর আমদানির বিদ্ধে প্রতিবাদ, বহুলতম প্রচারের ব্যাপকতম মাধ্যমিকতার বিদ্ধে প্রতিবাদ। লিটল ম্যাগাজিন বললেই বোঝা গেল যে জনপ্রিয়তার কলঙ্ক একে কখনো ছোঁবে না, নগদমূল্যে বড়োবাজারে টিকবে না কোনোদিন, কিন্তু হয়তো ---কোনো একদিন এর একটি পুরনো সংখ্যার জন্য গুণীসমাজে উৎসুকতা জেগে উঠবে। সেটা সম্ভব হবে এই জন্যই যে এটি কখনো মন জোগাতে চায়নি, মনকে জাগাতে চেয়েছিল, চেয়েছিল নতুন সুরে নতুন কথা বলতে, কোনো এক সন্ধিক্ষণে, যখন গতানুগতিকতা থেকে অব্যাহতির পথে দেখা যাচ্ছে না, তখন সাহিত্যের ক্লান্ত শিরায় তণ রক্ত বহিয়ে দিয়েছিল --- নিন্দা, নির্যাতন বা ধনক্ষয়ে প্রতিহত না হয়ে। এই সাহস, নিষ্ঠা, গতির একমুখিতা, সময়ের সেবা না করে সময়কে সৃষ্টি করার চেষ্টা--- এইটেই লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম। এই কুলধর্মের কথা মনে রেখেই, সাময়িকপত্রের নামমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টাকে সরিয়ে রেখে, নতুন শতাব্দীর জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।